জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন

জমাটবাঁধা অন্ধকার ছুঁয়ে কল্পনার রাজ্যে কাটছে দুঃসহ সময়

চার দেয়ালের মাঝে বন্দি হয়ে আছেন গত ১৫ বছর

তারুণ্যকে কখনো বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। আবার এর বিপরীতটাও সত্য, খুব অল্পতেই বুড়িয়ে যায় কেউ কেউ। লুই আই কান যে বয়সে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নিয়ে মেতে ছিলেন, ঠিক সেই বয়সে এসেই স্মৃতিসৌধের স্থপতি একুশে পদক বিজয়ী সৈয়দ মাইনুল হোসেন হয়ে গেছেন একেবারে চুপচাপ। তিনি মনে করেন তার আর দেবার কিছু নেই। চারদিকে অনতিক্রম্য, দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতা। নিষেধের বেড়াজাল। নানা কবি গোলাম মোস্তফার বাড়িতে একরকম নির্জন বাস করছেন তিনি। মেঝের ওপর পুরু হয়ে জমেছে ময়লা। মাকড়সা বিছিয়েছে জাল সর্বত্র। পোকা-মাকড়ে পেতেছে সংসার। তার মধ্যে ভাঙাচোরা আলমিরা, চিরস্থায়ীভাবে মশারি টানানো নড়বড়ে খাট, ব্যবহার অনুপযোগী কিছু তৈজসপত্র আর একটা ট্রানজিস্টার সম্বল করে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন কর্মহীন জমাটবাঁধা নিকষকালো সময়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বদরুল হায়দার ছাড়া কেউ তার খোঁজ করে না। কাছে এসে শুধোয় না- কেমন আছো? সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত অসম্ভব মেধাবী এই স্থপতি দিন রাত ভয়ে থাকেন এইবুঝি আমেরিকা এসে সর্বস্ব লুটে নিল। রাশিয়া চালাল তার গলায় খুনে ছুরি। কারা যেন তাকে থাকতে বলেছে চুপচাপ। নিষেধ করেছে কাজ করতে। কথা বলতে। ড্রয়িং, ড্রাফটিং আর ডিজাইনের স্বপ্নিল জগতে ফিরে যেতে। যৌবনে আড্ডায় সদা মুখর থাকা এই মানুষটি এখন কথা বলতে ভয় পান। এখন তার কোনো কিছুই 'ঠিক নেই'। সারা দিন হাঁটাহাটি করেন, সিগারেট খান, রেডিওতে বিবিসি শোনেন। তার মতে, বাংলাদেশের খবরে কিছু বোঝা যায় না। সঠিক খবর পেতে হলে বিবিসি শোনা দরকার। সেপ্টেম্বর ইলেভেনের পর তার জীবন আরো বিপর্যস্ত। আমেরিকা তার দিকে তাকিয়ে থাকে কড়া চোখে।... বোঝাই যায় শিল্পী মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। তার চিকিৎসা দরকার। ঠিকমত চিকিৎসা করলে সিজোফ্রেনিয়ার রোগী ভালো হয়ে যায়। গত বছরের আলোচিত রিতা-মিতাই নিকট অতীতের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। অথচ চিকিৎসার অভাবে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন মাইনুল ইসলাম। নিকটাত্মীয়রা তো নয়ই, সরকারও এ ব্যাপারে কখনো কোনো উদ্যোগ নেয়নি। স্থপতির সাক্ষাৎকার নিয়ে তার বর্তমান অবস্থার কথা জানাচ্ছেন **শামীম সুফী** ও **মাহমুদ রাজু**

ছোট্ট মাইনুলের শখ নানা কবি গোলাম মোস্তফার হাত ধরে বেড়াতে যাবে। অনেকক্ষণ ধরেই সে উসখুস করছে। কিন্তু তাঁর কাছে ঘেষা যাচ্ছে না। কারণ তিনি লেখালেখিতে ব্যস্ত। নানার সামনে দিয়ে কয়েকবার আসা-যাওয়া করল মাইনুল। লেখার টেবিলের আলো রোধ করে দাঁড়াল। তাতে বৃদ্ধের মনোযোগ নষ্ট হলো না। তিনি একমনে লিখে চলেছেন। আলো-আঁধারের সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝার মতো অবস্থায় তিনি এখন নেই। মাইনুল গলা খাকারি দিল। কাশল। কাশিটাকে প্রলম্বিত করল। কাশি না এলে কষ্ট করে কাশাটা খুব কষ্টের। বড় অর্জনের জন্য এই কষ্টটাকে মেনে নেওয়া যায়। কাশিটাকে সে যক্ষা রোগীর কাশির ছন্দে নিয়ে ফেলল। তার পরও লাভ কিছু হলো না। কি যেন ছাইপাশ লিখে চলেছেন নানা,

মাইনুল হোসেনের সৃষ্টি : অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন জাতীয় স্মৃতিসৌধ

মাইনুল তার কিছুই বুঝতে পারে না। সে শুধু বোঝে সন্ধ্যা হতে চলল, এক্ষুনি না বেরুলে আজ আর বেড়ানো হবে না। লিখতে লিখতে নাতির সব কর্মকাণ্ডই খেয়াল করে চললেন নানা। মুখে তার মিটিমিটি হাসি। আরেকটু খেলতে ইচ্ছা করল নাতিকে নিয়ে। দেখা যাক টেনশান কেমন সামাল দিতে পারে সে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য মত বদলালেন। গাম্ভীর্যের খোলসটা ছেড়ে হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত ধরে বেড়াতে বেরুলেন। মাইনুলের ভাষায়- আব্দার করা লাগত না। নানা এমনিতেই তাদের বিভিন্ন উপহার দিতেন। ছেলেবেলার এসব স্মৃতি মাইনুলের কাছে এখন অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সেই মাইনুলের মনে হয়- বয়স হয়েছে। শরীর দুর্বল। স্মৃতিগুলো তাই ঝাপসা হয়ে এসেছে। ছেলেবেলার সব কিছু মনে না

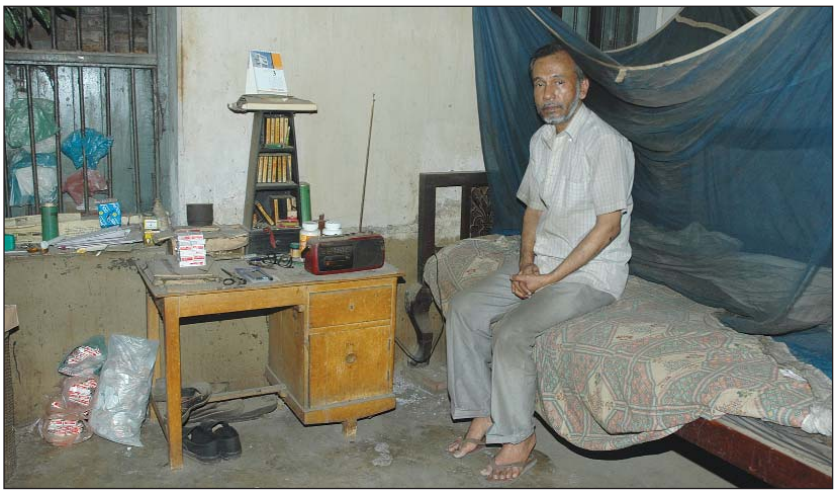

এই নোংরা অগোছালো ঘরেই তার ২৪ ঘন্টার জীবনযাপন

করতে পারলেও ছবি আঁকাআঁকির কথাটা অবশ্য ঠিকই মনে আছে তার। যেসব ছবি আঁকতেন সেগুলো 'তেমন কিছু হত না', কিন্তু শিশুমনের খেয়াল মেটাবার জন্য সেটাই ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া ভাবতেন খুব। ভাবনার বিষয়ের কোন ঠিক ছিল না। যখন যা মনে আসত সেটা নিয়েই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতেন।

তখন কি বড় হয়ে শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন? 'না ঠিক তা নয়। একটা কিছু হব সেটা জানতাম, কিন্তু কী হব বা কী হতে চাই সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। কারণ ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত অনেক বিষয়ে লেখাপড়া করলেও যেই আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলেন, ওমনি একটা সিঙ্গেল ট্র্যাকে পড়ে গেলেন। এরপর লক্ষ্যটা ওই নির্দিষ্ট সাবজেক্টই নির্ধারণ করে দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বুয়েটে আর্কিটেকচারে ভর্তি হবার পরই কেবল আমি লক্ষ্য নির্ধারণ করলাম- স্থপতি হব। এর আগ পর্যন্ত সবকিছুই ছিল অনিশ্চিত।'

'বাবা ছিলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। পরে যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হয়েছিলেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে খুব কড়া মানুষ ছিলেন। আমি অবশ্য বইপত্র তেমন পড়তাম না কিন্তু পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতাম সবসময়ই। কারণ অল্প পড়লেই আমার হয়ে যেত। বুয়েটে পড়ার সময়ও দেখা যেত সবাই মৌমাছির মত গুনগুন করে পড়ছে আর আমি আলমিরার ওপরে পাতা খাটে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি। ছাদ থেকে মাত্র ২-৩ ফুট নিচে নীচে ছিল আমার খাট। পরীক্ষার সময় ছাড়া অন্য সময় হলে থাকতাম না বলে বন্ধুরা আমার খাটটিকে আলমিরার ওপর তুলে রেখেছিল। আমিও আর সেটাকে কষ্ট করে নামাতে যেতাম না। ওখানেই শুতাম। পড়ে যেন না যাই সেজন্য খাটের কিনারে লোহার রড লাগিয়ে নিয়েছিলাম।'

আমি অবশ্য বইপত্র তেমন পড়তাম না কিন্তু পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতাম সবসময়ই। কারণ অল্প পড়লেই আমার হয়ে যেত। বুয়েটে পড়ার সময়ও দেখা যেত সবাই মৌমাছির মত গুনগুন করে পড়ছে আর আমি আলমিরার ওপরে পাতা খাটে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি

আধো অন্ধকারে স্মৃতিচারণ করছিলেন মাইনুল। বিদ্যুৎ চলে গেছে। মেঝেতে মোমবাতি জ্বালিয়ে আমি, রাজু, টিটো ভাই আর মাইনুল সাহেব আমরা চারজন বসে আছি। এ বাসায় কিছুদিন আগে আসা কাজের মেয়েটার ন্যাংটো ছেলেটা ওপাশের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে এদিকে কি হচ্ছে। তার চোখে বিস্ময় এবং ভয়। শিল্পী তার সদ্য ছড়ে যাওয়া কনুইয়ে হাত ঘষছেন আর কথা বলছেন। মাঝে মাঝেই তার মধ্যে জাগছে অহেতুক সন্দেহ। প্রায়ই বলছেন, 'আমার মনে হচ্ছে ইন্টারভিউটার পেছনে অন্য কোনো ব্যাপার আছে। এটা কোন চক্রান্ত হতে পারে। পেছনে কারা কী বদনাম করে কে জানে?' কখনো হেসে উঠছেন। কখনো কথা বলতে অস্বীকার করছেন। আবার যখন কথা বলছেন তখন খুব স্পষ্ট করে বলছেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠা দিনগুলোর কথা স্মরণ করলেন।

উনসত্তরে ভর্তি পরীক্ষা হলো বুয়েটে। চান্স পেলাম। সত্তরে ক্লাস শুরু হলো। আমাদের ব্যাচে আমরা সবাই ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলাম। শিক্ষাজীবনের সেই দিনগুলো কখনো ভুলবার নয়। কত মজা যে করেছি! একবার এক অনুষ্ঠানে পুরো ৭ বোতল কোক একাই সাবড়ে দিলাম। হল প্রভোস্টের টেলিফোন লাইন থেকে প্যারালাল লাইন রুমে নিয়ে দুষ্টুমি করলাম কিছুদিন। আরেক দিন হলে খাবার না পেয়ে আমি আর বদরুল পুরান ঢাকার ইসলামপুরে সাইনো পালোয়ানে গেলাম বিরিয়ানী খেতে। গিয়ে দেখি বিরিয়ানীও শেষ। তখন দুজনে দুই প্লেট ভর্তি করে মিষ্টি নিয়ে পেট ভরে খেলাম। তবে সবচেয়ে মজা হলো যেদিন আমরা হলের সবগুলো বাথরুম বন্ধ করে দিলাম, সেদিন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের খুব বেশি বনিবনা ছিল না। ওরা আমাদের পিছে লেগে থাকত সব সময়। কারণ ইউনিভার্সিটির সব কাজে আমরা সবার আগে থাকতাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ সাজাতে, অনুষ্ঠানে গান গাইতে কিংবা কবিতা পাঠ করতে-সব কাজেই আমাদের ডাক পড়ত। হলেও আমাদের সঙ্গে প্রায়ই ওদের লেগে যেত। গোসল-বাথরুম করা নিয়ে ঝগড়া লাগত। একদিন আমরা চার বন্ধু রাত করে হলে ফিরছি। হঠাৎ মনে হলো ওদের একটু শাস্তি দিয়ে যাই। সবগুলো বাথরুমের দরজার উপরে খানিকটা ফাঁক আছে। আমরা বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে ওপরের ওই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এভাবে নিচতলা-উপরতলার সবগুলো বাথরুম ভেতর থেকে আটকে দিলাম। এরপর অপেক্ষা করার পালা। সকালে বাথরুমগুলোর সামনে মৌন মিছিল শুরু হলো। ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সবাই ভেবেছে ভেতরে কেউ আছে। তারা বারান্দায় এসে পেট চেপে ধরে পায়চারি করছে। কেউ কেউ থাকতে না পেরে ডিপার্টমেন্টে চলে গেল ওখানকার বাথরুম ব্যবহারের জন্য। আমরা ভালো মানুষের মতো ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম আর দুর্দশা দেখে মনে মনে অট্টহাসি দিলাম।'

মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন কি না জিজ্ঞেস করলাম। নস্টালজিক হয়ে পড়লেন। 'মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডিও শুনতাম। সারাটা সময় পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। এই ঢাকা, এই ফরিদপুর। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আজকাল কত নাটক হয়। একজন কেউ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেই আগে যত পাপই করে থাকুক, সে খাসা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে পড়ে। আর আসল যারা মুক্তিযোদ্ধা, তারা থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। কেউ তাদের খোঁজ করে না। ... আমার কথা যদি বলেন, স্মৃতিসৌধের এই যে নকশাটা করলাম এটাও কি মুক্তিযুদ্ধের একটা অংশ নয়?'

স্মৃতিসৌধ আমাদের চেতনার অংশ। মুক্তিযুদ্ধের ব্যথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পরিপাট্য আবেগ, রুদ্ধ কান্নার সাক্ষী, বীরের রক্তের স্বীকৃতি। স্মৃতিসৌধের নকশাটা অনন্য। সামনে থেকে দেখলে একরকম, আবার পেছন থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম। আকাশের পটভূমিকায়

একেক সময় রঙ বদলিয়ে একেক রূপ ধারণ করে। বাঙালির চিরন্তন মেজাজ, রুচি আর জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এরকম একটা নকশা কীভাবে আপনার মনে এল- প্রশ্নটা করতেই তিনি নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'দেখুন, নকশাটাতে আমি এমন একটা ব্যাপার রাখতে চেয়েছি, যেন দেখলেই মনে হয় মাটি ফুঁড়ে কিছু একটা বের হয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এই দেশের সম্পর্ক শিকড়ের সঙ্গে মাটির সম্পর্কের মতো। শিকড় প্রোথিত থাকে মাটির অনেক গভীরে। মুক্তিযুদ্ধও মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়ে রয়েছে। সাতটা স্তম্ভ রাখার কারণ হচ্ছে '৫২ থেকে '৬৯-এর মধ্যে মোট সাতটা বড় বড় আন্দোলন হয়েছে। বায়ান্নতে হলো ভাষা আন্দোলন, তাতেও পাঁচ আর দুই সাতের যোগ। ১৬ ডিসেম্বরে বিজয়, এখানেও পাচ্ছি ছয় আর একে সাত। তারপরে আমাদের বীরশ্রেষ্ঠের সংখ্যাও সাতজন। সেজন্যই সাতটি স্তম্ভ রয়েছে স্মৃতিসৌধে।'

৫৭টি নকশা পেছনে ফেলে সৈয়দ মাইনুল হোসেনের নকশাটা যখন চূড়ান্তভাবে মনোনীত হলো, তার তখনকার সেই আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। সে চেষ্টাও তিনি করলেন না। শুধু জানালেন তার সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরাও সেই আনন্দে শরিক হয়েছিল। পিচবোর্ডের ওপর যে ডামিটা করেছিলেন সেটা এখন আর নেই। নষ্ট হয়ে গেছে। সেটা নিয়ে তার কোনো খেদও নেই। জিনিস তো নষ্ট হবার জন্যই। তাছাড়া তার মতে, কাজটা এমন কিছু হয়নি যে সেটাকে জাদুঘরে সংরক্ষণ করতে হবে। নিজের সৃষ্টি নিয়ে অতৃপ্তি... সব বড় মানুষেরই যেমন হয়।

এখনকার কাজ কেমন হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতেই জানালেন- এখনকার কাজের কোনো খোঁজ-খবর রাখি না। আমাদের সময়ে বইপত্র ছিল সব বাইরের। আমেরিকা, ইতালি, জাপান এ সমস্ত দেশের। সে সময়ের স্থাপত্যে পশ্চিমা ঘরানার আঁচ পাওয়া যায়। এখনকার স্থাপত্যে সম্ভবত ভারতীয় ঐতিহ্যের টান রয়েছে।

লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বদরুলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে একটা ফার্ম দিলেন। ফার্মে তারা নতুন। লোকজন খুব বেশি এল না। ডিজাইন করে মাইনুলের ফিফটি মোটরসাইকেলের পেছনে চড়ে ডিজাইনটা আবার ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতেন বদরুল। তার পরও তারা পয়সা পেতেন না ঠিকমত। তাই পাততাড়ি গোটাতে হলো অল্প সময়ের মধ্যেই। তারপর দু'জনেই যোগ দিলেন বাংলাদেশ কনসালটেন্টস লিমিটেডে। সেখান থেকে শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটসে। মাঝখানে মাইনুল কুয়েতে চাকরি করেছেন চার মাস। মিসরীয়, পাকিস্তানি, নাইজেরিয়ান আর সুদানিদের প্রভাব ওখানে অনেক বেশি। তাদের সঙ্গে পেরে না উঠে ওখানকার চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হলেন।

খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য মাইনুল ঠিকমত ডিজাইন করতেন না। সে কথা তাঁকে বললে তিনি রেগেও যেতেন। বলতেন, আমার কাজ আমি ভালোই বুঝি। এই একগুয়েমির কারণেই ১৯৮২ সালে শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটসের চাকরি চলে যায়। তারপর বিভিন্ন ফার্মে টুকটাক কাজ করতে থাকেন। ১৯৮৭ সালে এসে আবার শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটস যোগদেন। '৮৮ সালে বন্ধু বদরুল নিজেই একটা ফার্ম করলেন। মাইনুলকেও ডেকে নিলেন নিজের ফার্মে। কিছুদিন কাজ করার পর মাইনুল আবার নিজের ইচ্ছামতো কাজ করা শুরু করলেন। ক্লায়েন্ট যেভাবে চায় সেভাবে ডিজাইন করতে তার ভীষণ আপত্তি। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি ডিজাইন করতেন নিজস্ব ঢঙে। এতে ক্লায়েন্টরা

বন্ধু বদi"ল হায়দার, সুখে-দুঃখে সাথী

হতো বিরক্ত। ফার্মকে কাজ দেয়াই তারা বন্ধ করে দিল। বাধ্য হয়েই বদরুল তখন মাইনুলকে নিজের পথ দেখে নিতে বললেন। নিজের পথ দেখে নেয়ার মতো বৈষয়িক বুদ্ধি মাইনুলের কখনোই ছিল না। তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে সৃষ্টিশীল। এ সময় শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটসের কর্ণধার স্থপতি কবি রবিউল হোসেন আবার তাকে কাজে যোগ দিতে বললেন। তবে এবার আর তাকে কাজ করতে হবে না। তার নামের সুনাম ব্যবহার করা হবে। বিনিময়ে তিনি একটা মাসোহারা পাবেন। যে টাকাটা তখন শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটস থেকে মাইনুল পেতেন, সেটা দিয়ে সংসার চালানো যায় না। নিরুপায় হয়ে মাইনুল তার পরও সেখানে থাকলেন। কিন্তু কিছুদিন পর সেই ভাতাটাও অর্ধেক হয়ে গেল। '৮৮ সালে তার অমর কীর্তি স্মৃতিসৌধের নকশা প্রণয়নের জন্য স্থাপত্যবিদ্যায় পেলেন একুশে পদক। '৯০ সালে এসে তার জীবনে প্রায় একই সঙ্গে তিনটি ঘটনা ঘটল। সিজোফ্রেনিয়া বৃদ্ধি পেল, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল এবং শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটস থেকে আবার বেরিয়ে এলেন। ওখানেই কর্মজীবনের ইতি। এরপর প্রায় ১৬টি বছর স্বেচ্ছাবন্দি আছেন চার দেয়ালের মাঝে। বাবা মারা গিয়েছিলেন আনেক আগেই। স্ত্রী ছেড়ে চলে গেলেও মা এবং ভাই তার সঙ্গেই ছিলেন। এখন তারাও কেউ নেই। শান্তিনগরের 'মোস্তফা মঞ্জিলে' মাইনুলকে একা রেখে তারা অন্য বাসায় থাকেন। রেলগাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে পল্লী দেখার মতো করে মাঝে মাঝে এসে দেখে যান।

এই প্রায় নির্বাসিত জীবনে মেয়েদের তার বড় বেশি করে মনে পড়ে। তার দুই মেয়েই বড় হয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। মায়ের সঙ্গে তারা আলাদা থাকে। তাদেরকে দেখার জন্য মাইনুলের বুক ফেটে যায়। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তারা থাকেন দূরে দূরে। মাইনুলের মতে, 'নিষেধ আছে। আমেরিকার বারণ আছে। ওদের এখানে আসাটা ঠিক হবে না।'

পরিবার নিয়ে মাইনুল কথা বলতে আগ্রহী নন। পরিবার নিয়ে কথা বলতে চাইলেই বলছেন, 'আমার মনে হচ্ছে এটা আর এখন ইন্টারভিউ হচ্ছে না। ইন্টারভিউ নামে অন্য কোনো চক্রান্ত চলছে।'

পরিবারের কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ না করলেও কথায় কথায় এক সময় তিনি ঠিকই বলে ফেললেন, 'এই তো সামনেই আমাকে বউ-মেয়েরা দেখতে আসবে। এখন আলাদা থাকলেও তখন আমরা এক সঙ্গে থাকব।' তিনি এখনো স্বপ্ন দেখেন তার ভাঙা সংসার জোড়া লাগাবার। নিজের অজান্তেই যখন কথাগুলো বলে ফেলেন, তখন তার চোখে-মুখে গভীর আবেগ খেলা করে যায়। লোডশেডিংয়ের কালো অন্ধকারেও মানবিক প্রেমের বর্ণিল আভা তার মুখমণ্ডলে অদ্ভুত এক দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়। শুধু সংসার জোড়া লাগাবার স্বপ্নই নয়, তিনি কর্মে ফিরে যাবার স্বপ্নও দেখেন। বললেন, 'আগামী জুলাই মাসে আবার যোগ দেব শহিদুল্লাহ এসোসিয়েটসে। এখন শরীর দুর্বল। বয়স হয়েছে, তাই বিশ্রামে আছি।'

বাইরে বের হন না বলে স্মৃতিসৌধেও যাওয়া হয় না। বললেন, শেষ গিয়েছেন পাঁচ-ছয় বছর আগে। ডিজাইন যেটা করেছেন সেটার সঙ্গে আসল স্মৃতিসৌধে কোন গরমিল হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করলে জানালেন, 'উপরের তলটা খুব রাফ হয়ে গেছে। আর স্তম্ভগুলো বেশ মোটা করে ফেলেছে। তবে এতে ডিজাইন বা থিমের কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

কথা শেষ করে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। ছবির জন্য পোজ দিলেন। তার তখনকার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল না তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। মনে হচ্ছিল একজন সদালাপি প্রৌঢ় অতিথিদের সঙ্গে কথা বলে সৌজন্য দেখাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মনে হচ্ছিল না ওই ছোট্ট বাড়িটার দুই-তিনটি ঘরেই তার পদচারণা সীমাবদ্ধ। মনে হচ্ছিল এই তো আরেকটু পরেই তিনি বেরুবেন। অফিসে যাবেন। নতুন কোনো ডিজাইন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বি. দ্র. : স্থপতি নিজের নামের বানান সৈয়দ মাইনুল হোসেন লিখলেও গণc র্ত বিভাগ স্মৃতিসৌধে তার নাম ফলকে বানান লিখেছে 'সৈয়দ মইনুল হোসেন'।